রবীন্দ্রসংগীতে কালের বিবর্তন : প্রসঙ্গ কথা ও ভাব

দেবশ্রী দোলন*

[সারসংক্ষেপ : সাহিত্য ও সংগীত ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একজন যুগপৎ স্রষ্টা। সমগ্র জীবনের সকল রচনার মধ্যে সংগীতকে তিনি সর্বাপেক্ষা অধিক প্রাধান্য দিয়েছেন। এ সকল সংগীতে তিনি বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবানুযায়ী কথা বসিয়েছেন। সেসকল গানে কখনও প্রকাশ পেয়েছে কৈশোরক অনুভূতি আবার কখনও প্রকাশ পেয়েছে পরিণত চিন্তা-চেতনা। বয়সের ধারা অনুযায়ী ঈশ্বরকে কখনও উপলব্ধি করেছেন পরমাত্মা রূপে, কখনও বন্ধু রূপে আবার কখনও জীবনদেবতারূপে। এ ধরনের অনুভূতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর রচনাকালকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। আর এ সকল পর্বে পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ পর্যায়ের গানের পাশাপাশি গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যে বয়সানুক্রমিক রচনাশৈলীর পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথম পর্বে যেভাবে তিনি এ সকল পর্যায়ের গান রচনা করেছেন, মধ্য বয়সের গানে দেখা যায় তার ভিন্ন রূপ, আবার পরিণত বয়সের গান রচনায় দেখা যায় কথার ভাবগাম্ভীর্য। সবমিলিয়ে পর্যায় ও বয়স অনুযায়ী ভাবাবেগের পরিবর্তন সুপরিস্ফুট হয়েছে কবির রচনায়। তারই সুবিস্তৃত পর্যালোচনা তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।]

রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সাহিত্য-শাখার মধ্যে সংগীতই সেই সোনারকাঠি যার স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকুমারী চকিতে চোখ মেলে চায়। রবীন্দ্র-প্রতিভার স্ফুরণ এবং ক্রমবিকাশে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল, ঠাকুরবাড়িকেন্দ্রিক সমকালীন সাহিত্য ও শিল্পের পটভূমি এবং সর্বোপরি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের প্রভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শৈশবের প্রথম ছন্দসচেতন দিনগুলি থেকে জীবনের শেষ প্রহরগুলি পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর কাছে কখনো কপটতা করেননি, আর তারই প্রতিদানস্বরূপ কাব্যলক্ষ্মী চরণ রাখেন তাঁর সুরের কমলটির উপর। যেখানে সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও সীমার মধ্যে অসীম অনির্বচনীয়ের চকিত রহস্যস্ফুরণ প্রত্যক্ষ অনুভব করাই গীতস্রষ্টারূপে তাঁর সাধনাতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত রচনাজীবনে বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ভাবধারার গান রচনা করেছেন। তাঁর চব্বিশ বছরের অনুভূতির সঙ্গে যোগসাযুজ্য রচনা করেছেন আশি বছরের ভাবনার। প্রথমদিকে যেখানে ঈশ্বরভাবনা প্রকাশ পেয়েছে ব্রহ্মভাবনার সাথে, মধ্যবয়সে সেই ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে আধ্যাত্মিকতায়। অন্যদিকে, শেষ বয়সের ঈশ্বরভাবনা প্রকাশ করেছেন আত্মিকতায় ও মননে। যেখানে ঈশ্বর আরাধনার গানে পূজা নয়, প্রেমের আধিক্যই লক্ষ্য করা যায়। এভাবেই তিনি তাঁর বিভিন্ন গানে বয়সের সাথে সাথে পরিণত অনুভূতির প্রকাশ করেছেন।

প্রথম বয়স

কিশোর রবীন্দ্রনাথের মানসভূমি গড়ে উঠেছিল ঠাকুরবাড়ির নিজস্ব পরিবেশ এবং বহিরাগত সুধীজনের সান্নিধ্যে। শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথ দুটি বিষয় প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁদের পরিবারকে কেন্দ্র করে। একটি হচ্ছে ব্রাহ্ম দার্শনিক আন্দোলন, অন্যটি স্বাদেশিকতা। ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে লালিত ব্রাহ্মসমাজের প্রেরণারূপে ব্রহ্মসংগীতের প্রচলন। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রাজা

*প্রভাষক, সংগীত বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

রামমোহন রায়। তাঁর লক্ষ্য ছিল সকল মানুষের জন্য একটি সাধারণ আধ্যাত্মিক মিলনমঞ্চ রচনা। তাঁর সেই চেতনাকে বিশ্বজনীন রূপ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অজস্র ভাবনা ও অনুভবের ছোঁয়ায় এক বিস্ময়কর রচনাকাণ্ড গড়ে তোলেন। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রীতির এ সকল গান ব্রহ্মসংগীত নামেও প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে *গীতবিতানে* সংকলনের সময় এই গানকে পূজা পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পর্যায়ের একটি গানের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

> সুরের গুরু দাও গো সুরের দীক্ষা
> মোরা সুরের কাঙাল, এই আমাদের ভিক্ষা। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ০৫)

এই গানটিতে রবীন্দ্রনাথ 'গুরু' বলতে পরম ঈশ্বরের কথাই বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি এই পূজা পর্যায়কে বিভিন্ন উপপর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। যার মধ্যে 'গান' নামক একটি উপপর্যায় আছে। সেখানে 'গুরু' বলতে একমাত্র পরম আরাধ্য প্রভুকেই বোঝানো হয়েছে বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথের কৈশোরক প্রবৃত্তিতে এমন সকল গানেই প্রভুর এই রূপটিকে বিমূর্ত হিসেবে বোঝানো হয়েছে।

পূজার পরেই আসে প্রেম। কবিভাবনায় ঈশ্বর ও মানবের যে যুগলরূপের সহাবস্থান বারেবারেই ঘটেছে, প্রেম পর্যায়ের গানগুলির বিশ্লেষণে সে স্বরূপটি স্বতোৎঘাটিত হবে। কেননা, প্রাণে জাগ্রত প্রেমই মানুষকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি সাড়া দিতে উদ্বুদ্ধ করে। রবীন্দ্রনাথের প্রেম ভাবনার প্রাথমিক পর্ব একান্তই রোম্যান্টিক, আনন্দ-বিষাদ মগ্নতায় আচ্ছন্ন।

এই পর্বের গানগুলো মূলত ব্যক্তিচিত্তের ভাব ও ভাবনার, বেদনা ও আনন্দের গান। এ বেদনা প্রধানত অচরিতার্থ প্রেমিক অথবা প্রেমিকার চিত্তবেদনা। তবে এ গান আনন্দে উজ্জ্বল নয়, প্রাণ কাপাঁনো উচ্ছল নয়, বরং বেদনার্ত অসীম বিরহের ভাণ্ডার থেকে কণায় কণায় পরিপূর্ণ। অন্যদিকে কবির মনে অকারণ বিরহ গুঞ্জরিত, তাই কিশোর কবির হাতেই রচিত হল—

> কিছুই তো হল না,
> সেই সব সেই সব সেই হাহাকার রব
> সেই অশ্রুবারিধারা, হৃদয়বেদনা (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৫৩৩)

এই অপূর্ণতার বেদনা একান্তই রোম্যান্টিক। *সন্ধ্যা সংগীত*, *কড়ি ও কোমল* পর্বের রবীন্দ্রনাথ কারণহীন বিষাদে মগ্ন। *মায়ার খেলায়* প্রেম ভাবনার স্বরূপ কিছুটা স্পষ্ট হলেও সেখানেও অসমাপ্তির দাহ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—"মধুর হুতাশে মধুর দহন, নিত নব অনুরাগে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ২৭৭)। যেখানে যৌবনদীপ্ত শান্তার প্রেম অস্থির এবং বেদনাক্লিষ্ট, তবুও এখানেই ভালোবাসার স্থিতিশীলরূপ নজরে আসে।

প্রতীক্ষারত কল্যাণধর্মী প্রেমের এরূপ চিত্রপটই রঙে, রূপে, ভাবে রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার গানে বেশি দেখা যায়। এসময়কার তেমনই কিছু গান হল—

> ক. 'দুজনে দেখা হল, মধুযামিনীরে'
> খ. 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে'
> গ. 'আমি চিনি গো চিনি তোমারে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ২১৭-৬১২)

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আশৈশব প্রকৃতি প্রেমিক। বাল্যকাল থেকেই 'ভৃত্যরাজতন্ত্রের' আওতায় কবি ছিলেন বদ্ধ। তবে মুক্ত প্রকৃতির উদার আকর্ষণ প্রতিক্ষণে তিনি অনুভব করতেন। *জীবনস্মৃতি*, *আমার ছেলেবেলা* প্রভৃতি গ্রন্থে কবির প্রকৃতি তন্ময়তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি নিয়ে লিখিত গানকে ঋতুসংগীতও বলা হয়। গানেই রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি বন্দনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। বিশ্বপ্রকৃতির নানা পর্যায়ে যখন সেই আনন্দ ছন্দ প্রকাশিত হয় নানা রূপে, নানাভাবে, মানুষের হৃদয় আপনা থেকেই তখন তাতে সাড়া দেয়। প্রথম বয়সে রবীন্দ্রনাথের

প্রকৃতি বন্দনা কিছুটা বিক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায়। পরবর্তীতে সাজাদপুর, শিলাইদহের প্রকৃতি শান্তিনিকেতনের মুক্ত পরিবেশ কবির প্রকৃতি ভাবনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

পনেরো-ষোল বছর বয়স থেকে চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি যত গান রচনা করেন তার মধ্যে খাঁটি ঋতুসংগীত ছিল সংখ্যায় অত্যন্ত কম। এ সময় তিনি ঋতুর রূপবৈচিত্র্যের সাথে মিল রেখে রাগেরও ব্যবহার করেছেন। তাঁর বর্ষার গানে যেমন দেখা যায় মল্লারের ঝলকানি অন্যদিকে বসন্তের গানে দেখা যায় বাহারের রূপলাবণ্য। আবার কখনো বসন্ত ও শরতের সম্মিলনে প্রকাশ পায় যোগিয়া-বিভাসের মিশ্রণ।

কথার বিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি সংগীত রচনার প্রথম যুগে জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায় না। আর তাই প্রাথমিক যুগের কোন স্বদেশি গান জাতীয় আন্দোলনকে প্রভাবিতও করেনি। হিন্দুমেলার যুগে ১৮৬৭ সালে বাংলাদেশ তখন স্বদেশি উত্তেজনায় উত্তাল। এর ধারাবাহিকতায় উনিশ শতকের শেষের দিকে এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় পর্যন্ত ধীরে ধীরে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন পযায়ে তাঁর অংশগ্রহণ দেখা যায়। সঞ্জীবনী সভা উপলক্ষে ১৮৭৭ সালে রচিত রবীন্দ্রনাথের 'এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন' প্রথম স্বদেশি গান। এ সময় কবির বয়স ছিল ১৮ বছর। জানা যায়—'তোমারি তরে সঁপিনু' গানটিও এসময়কার রচনা। রবীন্দ্রনাথের এ সকল দেশাত্মবোধক সংগীত প্রথম বয়সের উত্তেজনার স্বাক্ষর বহন করে। এই সমকালীন পটভূমির কিছু গান—

ক. 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'
খ. 'আমায় বোলো না, গাহিতে বোলোনা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৫-১৮২)

রবীন্দ্রনাথের পূজা, প্রেম, প্রকৃতি ও স্বদেশ ছাড়াও অন্যান্য ধারারও বেশ কিছু গান তিনি এ বয়সে রচনা করেছেন। তবে মাত্র ১৯ বছর বয়সে রচিত প্রেম পর্যায়ের গানে যে বৈচিত্র্য তিনি প্রকাশ করেছেন তাতে ঈশ্বরপ্রেমের মূর্তপ্রতিমা ফুটে উঠেছে। গানটি হলো—

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা
এ সমুদ্রে আর কভু হবো নাকো পথহারা। (রবীন্দ্রনাথ, ২০০৮ : ২৮৬)

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার প্রাথমিক পর্যায়ে ঈশ্বরকে এক ও একমাত্র মনে করে তাঁর হৃদয়ের মণিকোঠায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি মনে করতেন জীবনের চালিত পথে তিনিই একমাত্র অবলম্বন। তবে তাঁর এই পর্বের গানগুলিতে নিজস্ব ভাব ছাড়া অন্য কিছু দেখা যায় না। কিন্তু এটুকু স্পষ্ট যে রচনাগুলি ঐচ্ছিক ও আত্মপ্রয়োজনেই রচিত। এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কোন সাংগীতিক নীতিগত ধারা তৈরি না হলেও তিনি যে পুরো দস্তুর গীতিকার ও সুরকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন তা স্পষ্ট প্রতীয়মান। আর তা তখনই দৃশ্যমান হয় যখন তিনি তাঁর রচনাতে পাশাপাশি দুটো ধারা একই সাথে বয়ে নিয়ে চলে। একটি হচ্ছে প্রচলিত শাস্ত্রীয় সংগীতের ধারার অনুরূপে রূপদান অন্যটি ইউরোপীয় সুরের চলনে গান রচনা। যেহেতু পারিবারিক পরিবেশ অনুকূলে ছিল তাই রবীন্দ্রনাথের কান ও প্রাণ হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সংগীতের রসে পরিপূর্ণ ছিল। তাই এই সময়ের বেশিরভাগ গানই শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর ছন্দের আদলে রচিত হয়েছিল। আবার এর মধ্যে বেশিরভাগ গান হিন্দি ভাঙা সুরে ও রচনা করা হয়েছে। ধারণা করা যায়, হিন্দি গানের সুর সংগ্রহ করেই এ পর্বের ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পাঙ্গের গান রচনা করা হয়েছে। যার ফলে কালোয়াতি গানের একটি নির্দিষ্ট প্রথানুগ ধারায় তাঁর এ বয়সের গানগুলো স্থান পেয়েছে। এই বয়সে রচিত তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের ভাঙা গানগুলোর কিছ উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—

ভাঙা গান	**মূল গান**
শুভ্র আসনে বিরাজো	রুদ্রদেব ত্রিনয়ন

আছ অন্তরে চিরদিন কৈসে অব ধর ধীর
নব আনন্দে জাগো অধর ধরে বনবাঁশরী
এ কী এ সুন্দর শোভা বাজুরে মন্দর বাজু
এ পরবাসে কে রবে হায় ও মিঞা বেজনুওয়ালে (করুণাময়, ১৩৯৯ : ৫৫-৬৫)

এ সময়ে রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনে রচনা ধারার এক অন্যতম জোয়ার দেখা যায়। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইউরোপীয় সুরের চলনকে বাংলায় ব্যবহার করে সফল হয়েছেন। ১৮৮১ সালে সর্বপ্রথম রচনা করেন গীতিনাট্য *বাল্মীকি প্রতিভা*। যার মূল ভাব ছিল ঈশ্বরে আনুগত্য। ডাকাত প্রধানের ঈশ্বরে ভক্তি প্রতিষ্ঠার যে গল্প তা-ই প্রতিভাত হয়েছে এ গীতিনাট্যে। ১৮৮২-তে *কালমৃগয়া* ও ১৮৮৮-তে *মায়ার খেলা* গীতিনাট্য দুটি রচনা করে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনার দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এসকল গীতিনাট্যে কাহিনি ও চরিত্রের যে অসামান্য বুনন তা রচনার ভাবকে আরও মূর্তিমান করে তুলেছে। এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পরীক্ষামূলক রচনার মধ্যে *ভানুসিংহের পদাবলী* অন্যতম। এখানেও কবি কথা ও সুরের এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি করেছেন। ব্রজবুলি ভাষায় রচিত মোট ২০টি পদের মধ্যে ৯টি পদে ভাঙা কীর্তনের সুর বসিয়ে প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন পদাবলির অনুসরণে সাজানো হয়েছে।

মধ্যবয়স

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনকালই এক বৈচিত্র্যপূর্ণ পরীক্ষণের মধ্যে কেটেছে। তাঁর রচিত গানগুলো ভিন্ন ভিন্ন বয়সে পেয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা। সেরকমই জীবনের দ্বিতীয় পর্ব যা মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক ভাবনায় নানান চিন্তার প্রকাশ, বিচিত্র ভাবনার সংযোজন হয়েছে। এখানে কবির আরাধ্য দেবতা অনেক আন্তরিক। কেবল যে ভক্ত ভগবানের প্রতীক্ষাতে ব্যাকুল তাই-ই নয়, ভগবানও ভক্তের সঙ্গে মিলিত হতে ব্যগ্র। মহাসংগীতের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরের অপার লীলা অনুভব করেন। সেই লীলায় তিনি অংশ নিয়ে নিজেকে পরমের কাছে সমর্পণ করেন। এমন ঈশ্বরভাব নিয়ে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন কিছু অসামান্য গান। যেখানে বাণীতে পরম প্রভু দেখা দিচ্ছেন 'বন্ধু' হিসেবে। *গীতাঞ্জলি* (১৯১৩), *গীতিমাল্য* (১৯১৪) ও *গীতালি*-র গানগুলোতে তিনি ঈশ্বরের এরূপ 'বন্ধু' রূপকে উদ্ভাসিত করেছেন অনন্য আলোয়। এভাবেই দেখা যায় তিনি ঈশ্বরের সাথে একাত্ম হয়েছেন। সুরের মধ্যে ঐশ্বরিক জীবনোপলব্ধির নতুন নতুন ধ্যান-ধারণার অমৃত নির্যাস রূপ পেয়েছে তাঁর সকল পূজার গানে। তাই কবি গেয়েছেন—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই—
দূরকে করিলে নিকট, বন্ধু পরকে করিলে ভাই (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১০৭)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালে বহু জায়গায় গিয়েছেন, তবে জমিদারি সূত্রে তাঁর বাংলায় আসা তাঁর রচনায় বিশেষ বৈচিত্র্য যোগ করে। মধ্য বয়সে তিনি বেশ কয়েকবার শিলাইদহ-সাজাদপুর আসেন যা তাঁর পূজা পর্যায়ের গানে নতুন মাত্রা যোগ করে। পূজার অনেক গানে বাউলদের ভাবদর্শন মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাউলরা ঈশ্বরকে যে ভাবে উপলব্ধি করেছেন তিনিও তাঁর বেশ কিছু গানে তেমন ভাবার্থই প্রকাশ করেছেন। আর এই সাধনায় কবিগুরু যে একমত হয়েছেন তা স্পষ্টরূপেই বোঝা যায়। যেমন—

আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে
তাই হেরি তাই সকল খানে
আছে সে নয়ন তারায় আলোক ধারায়, তাই না হারায়
ওগো তাই দেখি তায় যেথায় সেথায়
তাকাই আমি যেদিক পানে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫১)

কবির এ বয়সের গানে আধ্যাত্মচেতনার পাশাপাশি সংশয়, বেদনা, প্রত্যাশা, ব্যর্থতা, বিরহ-মিলন সবকিছুই ধরা পড়েছে। ঈশ্বর এখানে কেবলমাত্র আনন্দ রসঘনরূপেই আবির্ভূত হন না। তিনি গভীর অন্ধকারে দুঃখরাতের রাজা হয়েও আসেন। তাই কবির এ সময়কার কিছু গান এরূপ—

ক. 'সন্ধ্যা হল গো ওমা'
খ. 'আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে'
গ. 'এই লভিনু সঙ্গ তব'
ঘ. 'তোমায় নতুন করে পাবো বলে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৮-১৪২)

রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সের প্রেমভাবনার প্রথম দিকে কিছু কিছু গানে রয়েছে বিষাদময়তার ধারাবাহিকতা। এ সময়কার গানে দেখা যায় বাতাসে কেবলই স্বপ্ন চয়ন করে চলেছেন কবি। এ বয়সেই তিনি রেখে গেছেন প্রেমের অকৃপণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ পর্বেই রূপাশ্রিত প্রেমভাবনা অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। একদিকে কবি তাঁর ভাবনাকে রূপের বাঁধনে না বেঁধে, ভালোবাসার অসংখ্য বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছেন। অন্যদিকে নির্মল আনন্দ-অনুভবে প্রিয়জনের সঙ্গে প্রাণের খেলায় লীলা রসেও মগ্ন হয়েছেন। প্রেমের ক্ষণচাপল্য এবং অস্থিরতা গানগুলির অবয়বে ছড়ানো কিন্তু বিরহ-মিলনের মধ্যে কবিচিত্তের অধীরতা, ব্যাকুল আর্তি ধরা পড়েছে। তবে লক্ষ করা যায়, এ বিরহতে প্রেম ও পূজা উভয়ই বিরাজমান। এ সময়ের কিছু গানের ধরন দেখলেই কবিচিত্তের ভাবনা ফুটে ওঠে—

ক. 'আমার সকল নিয়ে বসে আছি সর্বনাশের আশায়'
খ. 'আমি তোমার প্রেমে হবো সবার কলঙ্কভাগী'
গ. 'আমি রূপে তোমায় ভোলাবো না'
ঘ. 'আহা তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৮-১৪২)

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি পর্যায়ের গানের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তী ৪০ বছর বেশ সময় দিয়েছেন। এ সময়ে তাঁর লিখিত ঋতু সংগীত সংখ্যায় অনেক। বলা যায়, তিনি এ সময়ে প্রকৃতির মধ্যে প্রেমের রূপকল্পের সংযোগ স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাবলিতে এ সম্পর্কে বলেন—

> নরনারীর প্রেমের মধ্যে একটি অত্যন্ত আদিম প্রাথমিক ভাব আছে, তাহা বহিঃপ্রকৃতির অত্যন্ত নিকটবর্তী, তাহা জল, স্থল, আকাশের গায়ে গায়ে সংলগ্ন, ষড়ঋতু আপন পুষ্প পর্যায়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমকে নানা রঙে রাঙাইয়া দিয়া যায়। যাহাতে পল্লবকে স্পন্দিত, নদীকে তরঙ্গিত, শস্য শীর্ষকে হিল্লোলিত করে, তাহা ইহাকেও অপূর্বচাঞ্চল্যে আন্দোলিত করিতে থাকে। পূর্ণিমার কোটাল ইহাকে স্ফীত করে এবং সন্ধ্যাভ্রের রক্তিমায় ইহাকে লজ্জামণ্ডিত বধূবেশ পরাইয়া দেয়। এক একটি ঋতু যখন আপন সোনার কাঠি লইয়া প্রেমকে স্পর্শ করে, তখন সে রোমঞ্চ কলেবরে না জাগিয়া থাকিতে পারে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৪২ : ৫৯)

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন বয়সে বিভিন্ন ঋতুতে বিশেষ জোর দিয়ে গান রচনা করেছেন। তবে সুরযোজনায় ব্যতিক্রম দেখা যেত। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর বৃক্ষ-লতা-শস্যপূর্ণ প্রান্তর-গ্রাম-আকাশ-বাতাস-মাঠ ও ভরা নদীর কোলে অনেক সময় কাটিয়েছেন। এভাবেই কবির প্রকৃতির সঙ্গে নিজের সম্বন্ধ স্থাপনের সাধনা চলতে লাগল। সেই সময় প্রকৃতি তাঁর মনে যে রসের সঞ্চার করেছিল তার প্রকাশ দেখা গেল সাতচল্লিশ বছর বয়সে লেখা *শারদোৎসব* নাটিকার গানগুলিতে। *শারদোৎসবের* মতো সুন্দর ঋতুর গান আগে আর পাওয়া যায়নি। এই গানেই প্রকাশ পেল যে, ঋতুর সঙ্গে একটি আন্তরিক যোগস্থাপনা সূচনা তিনি করতে পেরেছেন। যেমন—

মেঘ বিমুক্ত শরতের নীলাকাশ
ভুবনে ভুবনে ঘোষিল এ আশ্বাস
হবে বিলুপ্ত মলিনের নাগপাশ,
জয়ী হবে রবি, মরিবে মরিবে তম রে (রবীন্দ্রনাথ, ২০১১ : ২৭৪)

এছাড়াও রবীন্দ্রনাথের মধ্যবয়সে রচিত বাউল সুরাশ্রিত দেশাত্মবোধক গানে ভাবের এক অন্য ধারা-ই সৃষ্টি হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এ বয়সে স্বদেশি-সংগীতের তথা স্বাদেশিকতার উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ১৯০৫ সালে এই পটভূমিতেই স্বদেশি-সংগীতের চূড়ান্ত বিকাশ দেখা যায়। এই গানগুলি কেবল জনপ্রিয়ই নয়, দেশপ্রেমের সাময়িক আবেদন নিবেদনের গণ্ডি ছাড়িয়ে গানগুলির কাব্যমূল্য পৌঁছে যাচ্ছে সর্বদেশে, সর্বকালে। কেবল এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ পর্যায়ের সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মধ্যবয়সে স্বদেশি-সংগীত ধারায় বাউলসুরকে বা লোকসুরকে প্রাধান্য নিয়েই বেশিরভাগ গান রচনা করেছেন। এ সকল স্বদেশি-সংগীতের কথা বা গানের বাণী অত্যন্ত সাবলীল ও সর্বজনবোধ্য করে তৈরি করেছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে সর্বস্তরের মানুষের উদ্বুদ্ধকরণে রচিত গান অনেকটাই সাড়া জাগিয়েছিল সেসময়। এ পর্বে রচিত এমন কিছু গান হলো—

ক. 'এবার তোর মরা গাঙে'
খ. 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে'
গ. 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৪-১৮১)

সংগীত রচনার এ পর্যায়ে তিনি গানের ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষণেও আগ্রহী হয়েছিলেন। ঝম্পক, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল প্রভৃতি তালগুলোও তাঁর এ বয়সের রচনা। এছাড়া এই সময়কার রচনাতেও তাঁর অল্পসংখ্যক হিন্দি ভাঙা গান লক্ষ করা যায়। কিন্তু ১৯২৫-এর পরে তাঁর এ ধরনের আর কোন রচনা লক্ষ করা যায়নি। এছাড়া *নৈবেদ্য*, *অচলায়তন*, *খেয়া*, *চৈতালী*, *উৎসর্গ* প্রভৃতি গ্রন্থের গানগুলিও রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার রচনা।

পরিণত বয়স

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে বা রচনার শেষ পর্বে তাঁর সৃষ্টিতে এসেছে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও হয়েছে আরও পরিণত। তাই তো এই সময়কার গানকে বলা হয় পরিণত বয়সের গান। এই বয়সে রবীন্দ্রনাথ পূজা, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ প্রভৃতি পর্যায়ে আরও বেশি পরিণত গান উপহার দিয়েছেন। এই পর্বই কবির ঈশ্বর আরাধনার শেষ পর্ব। রবীন্দ্র ভাবনায় প্রশান্তির স্নিগ্ধতা। আসন্ন মৃত্যুর সুস্থির আলোয় কবি সেই পরম প্রিয়তমের আগমন প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবন-মরণের সীমানা ছাড়িয়ে সেই অপরূপ ঈশ্বর, জীবননির্ভর বন্ধু দণ্ডায়মান। সে সময়কার বা তার পরবর্তী গানে কথার অর্থ মূলত একই। এ সময়কার গানে পূজা নয়, প্রেমের আধিক্য লক্ষ্য করা যেত। এ বয়সে তিনি প্রেম ও পূজার পার্থক্য বুঝতে পেরেছিলেন। অধ্যাত্মবোধটাকে তিনি অধিকতর আত্মিক ও মনের মধ্যে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। পূজা পর্যায়ের 'বন্ধু' উপবিভাগের পর তিনি ক্রমান্বয়ে 'প্রার্থনা' উপশিরোনামে গানের সংকলন করেছেন। তবে *গীতাঞ্জলির* প্রথম গানটিকে তিনি প্রার্থনা সংগীত না বলে 'বিবিধ' উপশিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। গানটি হচ্ছে—"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধূলার তলে" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৩৬)। এরপর ক্রমান্বয়ে দুঃখ, বিরহ, উৎসব প্রভৃতি উপশিরোনামের পর আনন্দ উপশিরোনামে সংকলিত হয়েছে ২৫টি গান। কবি বলেছেন, অন্তহীন আনন্দে তাঁর অঙ্গ গড়া। তাঁর প্রতি অণু-পরমাণু আলোর সঙ্গ পেয়েছে। আনন্দ ও আলোর সঙ্গে থেকে আসছে প্রেম। প্রেমে-প্রাণে-গানে-গন্ধে-আলোকে-পুলকে মিলেই জীবন। যে জীবন নিত্য দিন অমৃতে স্নাত বলে কবি বিশ্বাস করেছেন। তাঁর রচনায় বিশ্বের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে গান আছে। আর আমি-তুমি সম্পর্কের প্রশ্নটি এসেছে সেখান থেকেই। কবি বলেন—

মহাবিশ্বে মহাকাশে মহাকালমাঝে
আমি মানব একাকী ভ্রমি বিস্ময়ে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৯৮)

আমি তুমি সম্পর্ক নিয়ে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ এটি। এটি ঈশ্বরের সাথে আমি তুমি দর্শনভাবনার একটি ব্যতিক্রমী রচনা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের সংকলনের এক পর্যায়ে বাউল উপপর্যায়ও তৈরি করেন। রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতায় বাউলবাদ নানা মাত্রায় পরিপুষ্ট হতে থাকে। ঔপনিষদিক ক্ল্যাসিকাল দর্শনের সঙ্গে লৌকিক বাউল দর্শনকে মিশিয়ে তিনি আপনদর্শনচিন্তা নির্মাণ করেন। এরপর 'পথ' ও 'শেষ' উপশিরোনামে তিনি গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ গানে ঘোষণা করেছেন, তিনি দাঁড়াতে চান তেমন স্থানে যেখানে সকল পন্থা এসে মিলেছে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূজা পর্যায়ের গানের সংকলন ও উপস্থাপন শেষ করলেন। রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব হলো যে, এর কেন্দ্রস্থলে এক সর্বজনীন, সর্বকালীন ঈশ্বরকে স্থাপন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন মানুষকে মেলাতে চেয়েছেন। সেই মিলনসাধনের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হিসেবে কাজ করছেন তাঁর পরমেশ্বর। গানে গানে তিনি সব মানুষকে মিলিয়ে দেন। বিশ্বের এর বিস্ময়কর অধিষ্ঠান এই পূজা পর্যায়ের গান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে প্রেম পর্যায়ের গানে ভালোবাসার অশেষ বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। প্রায় প্রৌঢ়ত্বের দ্বারদেশে উপনীত কবির হাত থেকে *মহুয়ার* মতো প্রেমকাব্য *শেষের কবিতা*র মতো উপন্যাস পাওয়া গেছে। প্রেম এখানে 'স্বপ্নমদির নেশায় মেশা' উন্মত্ততা নয় জীবন-রসিক কবি প্রেমের রূপ ও রাগের নিত্য নবীনতায় প্রাণপ্রাচুর্যে এখানে স্থিত, কবি স্বীকৃত মন্তব্যটি এ প্রসঙ্গে অনুসরণযোগ্য।

> প্রথম বয়সে আমি হৃদয়ভাব প্রকাশ বারবার চেষ্টা করেছি গানে, আশাকরি সেটা কাটিয়ে উঠেছি পরে। পরিণত বয়সের গান ভাব বাৎলাবার জন্য নয়, রূপ দেবার জন্য। তৎসংশ্লিষ্ট কাব্যগুলিও অধিকাংশই রূপের বাহন। (রবীন্দ্রনাথ, ১৩৭৩ : ১৭২)

প্রেম এখানে পূর্ণিমা নিশীথের বিলাস বিভ্রমকারী জ্যোৎস্না সঙ্গিনী নয়। ভালোবাসা এখানে কঠিন মোহাবেশমুক্ত। তবু জয়ের আনন্দে বিচ্ছেদের রোমান্টিক বেদনা জেগে ওঠে। চিরপথিক কবি ভালবাসার শাশ্বত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন চলার ছন্দে। তাই কবির ভাবনায় আসন্ন বিদায়ের সুর অনুরণিত। কবির এ বয়সের গানগুলো এরকম—

ক. 'আমার নিশীথ রাতের বাদল ধারা'
খ. 'কাল রাতের বেলা গান এলো মোর মনে'
গ. 'কবে তুমি আসবে বলে'
ঘ. 'আমি কান পেতে রই'
ঙ. 'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৫০-৩৫৩)

রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রেমের গান আছে যেখানে বক্তা পুরুষ, আবার অনেক প্রেমের গান আছে যেখানে বক্তা নারী। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বা ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষার রূপটি প্রধানত মূর্ত নয়, অমূর্ত। সমগ্র প্রেরণাই যেন বক্তার বোধকে গভীরভাবে সৃজন করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের ভালোবাসার গান, আত্মবোধের গান, অমলিন শুভ্রতা সন্ধানী কবির আত্মসচেতনতা। কবি এভাবেই প্রেমের গানে সর্বপ্রকার অনুভবে পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে।

১৩২৮ সাল থেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ ২০ বছরের আরম্ভ। অর্থাৎ তিনি ষাট বছর বয়সে পা রাখলেন। ঋতুর গানের দিক থেকে এই সময়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শান্তিনিকেতনে

তাঁর এই ২০ বছরব্যাপী সাধনার প্রকৃত পরিচয় এখনই প্রকাশ পেল। অথবা বলা যায়, এ সময় থেকেই তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সার্থক পরিণতি দেখা গেল। এখন থেকেই রচনা করতে লাগলেন গ্রীষ্ম ও হেমন্তের গান। এই প্রথম তারা প্রবেশের অধিকার পেল।

রবীন্দ্রনাথের গানের ভিতর দিয়ে বাংলার ষড়ঋতুর লীলার মধ্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যে অভ্যন্তর ছন্দটি বিকশিত হয়ে উঠেছে তাকে আমরা নিবিড় করে পাই। রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত বর্ষামঙ্গল, ফাল্গুনী, শারদোৎসব, শেষবর্ষণ, বসন্তোৎসব, ঋতুরঙ্গ প্রভৃতি ঋতু উৎসবে। তাঁর রচিত অজস্র গান আমাদের মধ্যে সেই বোধকেই তীব্র করে তুলেছে যে, মানবপ্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি একটি অখণ্ড সূত্রে গাঁথা। রবীন্দ্রনাথের রচিত ষড়ঋতুর কিছু গান উদাহরণস্বরূপ দেয়া হলো—

গ্রীষ্ম- i. 'নাই রস নাই'
ii. 'বৈশাখ হে মৌনীতাপস'
বর্ষা- i. 'আমি কী গান গাব যে'
ii. 'মন মোর মেঘের সঙ্গী'
শরৎ- i. 'শরতে আজ কোন্ অতিথি'
ii. 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়'
হেমন্ত- i. 'হিমের রাতে ঐ গগনের দীপগুলিরে'
ii. 'হায় হেমন্তলক্ষ্মী'
শীত- i. 'শীতের হাওয়ার লাগলো নাচন'
ii. 'পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে'
বসন্ত- i. 'আজি বসন্ত জাগ্রতদ্বারে'
ii. 'আজ খেলা ভাঙার খেলা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ৩০১-৩৬১)

রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতিভাবনার আলোচনার শেষে প্রাপ্ত সূত্রগুলি হলো—প্রকৃতিপ্রেমে রবীন্দ্রনাথ আদ্যোপান্ত রোম্যান্টিক। ১৩২৮ থেকে জীবনের শেষ ২০ বছরে প্রকৃতির অপরিসীম লীলারসে মুগ্ধ কবিমানস। প্রকৃতির এক প্রাণময়-সত্তার উপলব্ধি সম্ভবত শান্তিনিকেতনের জীবনযাত্রায় ধরা পড়েছে। শেষ পর্বে তাই সর্বাধিক রচিত হয়েছে প্রকৃতির গান।

রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনে স্বদেশ পর্যায়ের গান একটি নব উদ্দীপনার জোয়ার তুলেছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উত্তেজনা ও উন্মাদনার পরে কবি যেসব স্বদেশি-সংগীত রচনা করেন, তার বেশিরভাগই কোনো না কোনো অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত। গানগুলির আবেদন এক্ষেত্রেও সার্বজনীন ও সর্বকালীন। তবে এ সময় স্বদেশচেতনার প্রবাহ কিছুটা কম ছিল। তবে এ সময়কার গানে আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ববোধ তুলে ধরেছেন। যেমন—

ক. 'এ ভারতে রাখো'
খ. 'ও আমার দেশের মাটি'
গ. 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে'
ঘ. 'খরবায়ু বয় বেগে'
ঙ. 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৯৫ : ১৭৩-৩৯৪)

রবীন্দ্রনাথের এ সময়কার গানে কাব্যাংশে ছন্দের বন্ধনমুক্তি ও সহজগতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ বলা যায়, শেষ ২০ বছরে তাঁর রচিত যাবতীয় কাব্য রচনাতে তিনি গদ্যধারাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এর ফলে গানের কথার কাব্যবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্ট আকারে ধরা পড়ে। এধরনের কিছু গান হলো—

ক. 'ওগো আমার চির অচেনা পরদেশী'
খ. 'আজি কোন সুরে বাঁধিব'

গ. 'ওরে জাগায়ো না'
ঘ. 'যদি হায় জীবন পূরণ নাই হলো' (অমল, ১৯৭১ : ১২৮)

এছাড়াও রবীন্দ্ররচনার এ সময়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হচ্ছে—*চিত্রাঙ্গদা*, *চণ্ডালিকা* ও *শ্যামা* নৃত্যনাট্যসমূহ। জীবনের প্রথমভাগে রচিত গীতিনাট্যের সাথে এর পার্থক্য হল সংলাপ ও নৃত্য। অর্থাৎ গীতিনাট্যে একটি নাট্যকাহিনিকে গানের মাধ্যমে সংলাপবদ্ধ করা হয় আর নৃত্যনাট্যে নেপথ্যের গানের সাথে চরিত্রগুলির নৃত্য একসাথে মঞ্চায়ন করা হয়। বলা যায়, এই নৃত্যব্যঞ্জনাতে কাহিনি তার প্রকাশের ভাষা পায়। এছাড়াও তাঁর এ সময়কার রচনার মধ্যে *তাসের দেশ*, *বর্ষামঙ্গল*, *ডাকঘর* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র-জীবনের সংগীত-রচনার মূল উপজীব্য ছিল কথা ও ভাবের সমন্বয় সাধন। তাঁর প্রথম জীবনের রচনায় যেমন ছিল কৈশোরক প্রজ্ঞা, মধ্য ও শেষ জীবনের রচনাতেও ছিল ধারাবাহিক বন্ধনমুক্তির কথা যা তাঁর কাব্যে, গানে, নাটকে, প্রবন্ধে সর্বত্রই ধরা পড়েছে। ঈশ্বর যেমন তাঁর জীবনে কখনো বন্ধু, কখনো সখা আবার কখনো প্রিয়তমরূপে ধরা দিয়েছেন তেমনি কখনো তাঁর গুরু অথবা কখনো জীবনদেবতারূপেও ধারণ করেছেন। প্রকৃতি ও স্বদেশ পর্যায়ের গানেও তার স্বীয় ভাবের ব্যত্যয় চোখে পড়ে না। এই বন্ধনমুক্ত মানবাত্মার জয়গান তাঁর সকল ধারার সংগীতেরই অন্যতম ভাষা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এরূপ রচনা দ্বারা আজও স্বমহিমায় সমুজ্জল ও ভাস্বর।

সহায়কপঞ্জি

অমল মুখোপাধ্যায় (২০০১)। *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা।
করুণাময় গোস্বামী (১৯৯৩)। *রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা*। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
(২০১২)। *রবীন্দ্রসংগীতকলা* (দ্বিতীয় খণ্ড)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
গৌরী ভট্টাচার্য্য (২০০৭)। *রবীন্দ্রসংগীতের বিভিন্ন স্তর*। মেরিট ফেয়ার প্রকাশনী, ঢাকা।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯৯৫)। *গীতবিতান*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।
(২০০৮)। *গীতবিতান*। শুভম্, কলকাতা।
(২০১১)। *রবীন্দ্রসমগ্র* (নবম খণ্ড)। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।
(১৩৭৩)। *সংগীতচিন্তা* (সুর ও সংগতি)। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা।
(১৩৪২)। *রবীন্দ্র রচনাবলী*, বিচিত্র প্রবন্ধ (কেকাধ্বনি)। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা।
সন্‌জীদা খাতুন (১৯৯৯)। *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ*। অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।